রাষ্ট্র

ভি আই লেনিন

রাষ্ট্র — ভি আই লেনিন — ১৯১৯ সালের ১১ জুলাই সার্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। ১৯৭৫ সালে চীনের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

প্রকাশকাল ঃ বর্তমান বাংলা মুদ্রণ ঃ ৩১ অক্টোবর, ২০১৯

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা মাত্র

রাষ্ট্র

কমরেডস,

আজকের আলোচ্য বিষয় আপনারা যা স্থির করেছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন, তা হল রাষ্ট্র। আমি জানি না, আপনারা এই বিষয়টির সাথে কতটা পরিচিত। যদি আমি ভুল না করি, তা হলে এই প্রথম আপনারা বিষয়টি সম্পর্কে সুসংহতভাবে জানতে বা বুঝতে আগ্রহী হয়েছেন। যদি তাই হয়, তা হলে একটি আলোচনার দ্বারা এই জটিল বিষয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য যথেষ্ট সাবলীল এবং বোধগম্য রূপে সব শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে আমি সফল নাও হতে পারি। যদি তাই হয়, তা হলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ঘাবড়াবেন না, কারণ রাষ্ট্রের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়। সম্ভবত বুর্জোয়া তাত্ত্বিক, লেখক এবং দার্শনিকদের দ্বারা গুলিয়ে দেওয়া জটিল বিষয়গুলির মধ্যে এটি জটিলতম। ফলে আশা করা ঠিক হবে না যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ উপলব্ধি এই সংক্ষিপ্ত এবং প্রথম বারের আলোচনা থেকেই গড়ে উঠবে। এই বিষয়টির উপর প্রথম আলোচনার পর আপনারা কী বুঝতে পারেননি বা কোন বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি তা আপনারা নোট করুন এবং সেগুলি নিয়ে দুবার, তিনবার, চারবার ভাবুন যাতে যা আপনারা বুঝতে পারেননি তা নিয়ে পরে নানা আলোচনা, বক্তৃতা এবং পড়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করা যায়।

আমি আশা করি আমরা আবার এরকম একটি সভার আয়োজন করে উঠতে পারব, সংশ্লিষ্ট সব প্রশ্ন নিয়ে মত বিনিময় করে দেখতে পাব কোন বিষয়টি সবচেয়ে অস্বচ্ছ রয়েছে। আমি আরও আশা করি, আলোচনা এবং বক্তৃতা শোনার পাশাপাশি আপনারা অন্তত মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা পড়ার জন্য সময় দেবেন। আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমাদের বইয়ের যে ক্যাটালগ আছে তাতে পাবেন এবং সোভিয়েত ও পার্টিস্কুলের ছাত্রদের লাইব্রেরিতেও পাবেন।

এ ক্ষেত্রেও বিষযটি যেভাবে বইয়ে পাবেন, তাতে বোঝার অসুবিধা আপনাদের নিরাশ করতে পারে, কিন্তু আমি আবারও বলব, বিচলিত হবেন না। প্রথমবার পড়ার পর যা আপনাদের কাছে অপরিষ্কার থাকবে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে দ্বিতীয়বার পড়ার দ্বারা বা বিষয়টিকে নানা দিক থেকে বারবার ভাবার দ্বারা। আমি

আরও বলছি যে, এই প্রশ্নটি এত জটিল এবং বুর্জোয়া পণ্ডিত ও লেখকরা এত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন যে, কেউ যদি বিষয়টি গভীরে বুঝতে চান এবং যথার্থ ধারণা আয়ত্ত করতে চান তাকে বারবার নানা দিক থেকে প্রশ্নগুলি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে স্বচ্ছ এবং দৃঢ় উপলব্ধি গড়ে ওঠে। বিষয়টি এমন বুনিয়াদি এবং সব রাজনীতির মূল বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, বিপ্লবের যে উত্তাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তখনই শুধু নয়, এমনকী সবচেয়ে শান্তির সময়েও প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তেই সংবাদপত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা প্রশ্নে এই বিষয়টির সম্মুখীন হবেন বলেই বারবার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সহজ হয়ে উঠবে।

প্রতি দিন নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নেই ফিরে আসবেন যে, রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্রের প্রকৃতি কী? এর তাৎপর্য কী এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের পার্টি— কমিউনিস্ট পার্টি, যে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য সংগ্রাম করছে তার দৃষ্টিভঙ্গি বা বক্তব্য কী? আসল কথা হল, আপনারা যেহেতু বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে, অত্যন্ত তুচ্ছ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেও, অপ্রত্যাশিত জটিল মুহূর্তে এবং বিরোধীদের সাথে আলোচনা ও বিতর্কে রাষ্ট্র বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তাই রাষ্ট্র সম্পর্কে এই পড়া, আলোচনা বা বক্তৃতা শোনার মধ্য দিয়ে এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যাতে নানা প্রশ্নের জবাব নিজেই দিতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে পারেন এমন করেই যখন শিখে নেবেন তখনই কেবল আপনি নিজেকে আপনার প্রত্যয়ে সুদৃঢ় ভাবতে পারবেন এবং যে-কোনও মুহূর্তে প্রতিপক্ষের আক্রমণের সামনে আপনার প্রত্যয়ে অটুট থাকতে পারবেন।

সংক্ষেপে এই ক'টি কথা বলেই আমি রাষ্ট্র কী, কী করে তার উদ্ভব হল, রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি— যে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য লড়ছে, তার বক্তব্য কী, এ বিষয়ে আলোচনায় ঢুকব।

আমি আগেই বলেছি, বুর্জোয়া বিজ্ঞান, দর্শন, আইনশাস্ত্র, রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংবাদিকতা প্রভৃতির প্রতিনিধিরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হোক বা না হোক, রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রশ্নে যত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তা অন্য কোনও বিষয়ে পাওয়া যাবে না। আজও প্রশ্নটি প্রায়ই গুলিয়ে দেওয়া হয় ধর্মীয় প্রশ্নের সাথে। শুধু ধর্মীয় অবতার বা গুরুরাই নন (তাদের পক্ষে এমনটাই ভাবা স্বাভাবিক), যারা নিজেদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত মনে করেন, তাঁরাও প্রায়ই রাষ্ট্র সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকেও ধর্মের সাথে গুলিয়ে দেন এবং অনেক সময়ই অত্যন্ত জটিল একটা মতবাদ দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন যার আদর্শগত এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিধারা অত্যন্ত জটিল। যার মূল কথা হল, রাষ্ট্র একটি ঐশ্বরিক বিষয়, অতিপ্রাকৃত কিছু, এ হল এমন একটি শক্তি, যার জোরেই মানুষ টিকে আছে। এই শক্তি মানুষের সৃষ্টি নয়,

মানুষের ভিতরকার কিছু নয়, এ হল বাইরে থেকে পাওয়া এক ঐশ্বরিক শক্তি। এবং এটা বলতেই হচ্ছে, এই মতবাদ শোষক শ্রেণির— জোতদার, পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, বুর্জোয়া ভদ্র মহোদয়দের বিজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের সাথে তা এমন গভীরে মিশে আছে যে, সর্বত্রই আপনারা এর চিহ্ন দেখতে পাবেন। এমনকী 'মেনশেভিক' এবং 'সোসালিস্ট রেভলিউশনারিজ' — যারা দাবি করে যে, তারা ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা মোটেই আচ্ছন্ন নয় এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নকে প্রসন্ন মনে বিচার করতে সক্ষম, তাদের রাষ্ট্র সংক্রান্ত বক্তব্যের মধ্যেও ঐ নমুনা দেখতে পাবেন। রাষ্ট্র বিষয়টিকে এত বিভ্রান্তিকর এবং জটিল করা হয়েছে, কারণ তা শাসক শ্রেণিগুলির স্বার্থের সাথে অন্য সব বিষয়ের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ (অর্থনৈতিক ভিত্তি অবশ্য সবেচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত) । রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধর্মভিত্তিক মতবাদ সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগকে ন্যায্যতা দেয়, শোষণ ব্যবস্থা টিকে থাকার যৌক্তিকতা দেয়, পুঁজিবাদের টিকে থাকাকে সঠিক প্রতিপন্ন করে। সেই কারণে এই প্রশ্নে নিরপেক্ষতা আশা করা হবে মস্তবড় ভুল, যারা নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক বলে দাবি করেন, তাদের কাছ থেকেও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে এগোলে ঠকতে হবে। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে যত জানবেন এবং যথেষ্ট গভীরে ঢুকবেন তত উপলব্ধি করতে পারবেন এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক সংগ্রাম— যে সংগ্রামটি রাষ্ট্র সম্পর্কে, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং তাৎপর্য সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত বা অভিব্যক্ত হয়।

এই বিষয়টি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করতে হলে আমাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং বিকাশের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে। খুঁটিনাটি বিষয়ে বা পরস্পরবিরোধী অংসখ্য মতামতের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বা কোনও সামাজিক প্রশ্ন বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে বিষয়ের অভ্যন্তরীণ ঐতিহাসিক পরম্পরা ভুলে না যাওয়া, কীভাবে বিষয়টি ইতিহাসে এল সেখান থেকে বিচার করা, বিষয়টি বিকাশের পথে কোন কোন প্রধান স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং বিষয়টি কোন অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে, তা বিচার করা।

এ প্রসঙ্গে আমি আশা করি, আপনারা এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটি পড়বেন। এটি আধুনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা বিষয়ে একটি মৌলিক রচনা, যার প্রত্যেকটি বাক্য নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়, নিশ্চিতরূপে বলা যায় এখানে আলটপকা কোনও মন্তব্য করা হয়নি, বরং প্রভূত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক তথ্যের উপর এই লেখাটি প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, এই

লেখাটির সকল অংশ সমান আকর্ষণীয় ও দ্রুত বোধগম্যরূপে ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিছু অংশ, যাঁরা ইতিহাস ও অর্থনীতির কিছু জ্ঞান আহরণ করেছেন, তাঁদের জন্য লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি আবারও আপনাদের বলব যে, বইটি একবার পড়ে বুঝতে না পারলে বিচলিত হবেন না। একবার পড়েই বুঝতে পারার মতো লোক পাওয়া কঠিন। কিন্তু পরে আবার পড়লে যখন আপনার আগ্রহ জাগবে, আপনি এর সবটা না বুঝলেও অনেকটাই বুঝতে পারবেন। এই বইটির কথা আমি উল্লেখ করছি কারণ তা আলোচ্য বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেবে। বইটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসের রেখাচিত্র দিয়ে শুরু হয়েছে।

এই বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, অন্য সমস্ত প্রশ্নের মতো, যেমন পুঁজিবাদ, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, সমাজতন্ত্র— এগুলির উৎস কী, কীভাবে সমাজতন্ত্র এল, কোন পরিস্থিতিতে এল ইত্যাদি প্রতিটি প্রশ্নের মতোই রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক বিচারের জন্য রাষ্ট্রের বিকাশের সমগ্র ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। প্রথমেই লক্ষণীয়, রাষ্ট্র ইতিহাসে সবসময়ে ছিল না। এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। এটা সেখানেই এল এবং তখনই এল যেখানে এবং যখন সমাজটা বিভাজিত হয়েছে, শোষক এবং শোষিত এসে গেছে।

মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথম রূপ— দাসপ্রভু ও দাস, এই শ্রেণি বিভাজন আসার আগে ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যাকে অনেক সময় গোষ্ঠী পরিবারও বলা হয়ে থাকে। আদিম যুগে বহু আদিম মানুষের মধ্যে, আদিম সংস্কৃতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে, এমন সময় ছিল যাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজের কম-বেশি অনুরূপ বলা যায়, যেখানে দাসপ্রভু ও দাস এই শ্রেণি বিভাগ ছিল না। এবং সেই সময়ে কোনও রাষ্ট্রও ছিল না, জনগণকে বল প্রয়োগের দ্বারা অবদমন করার জন্য সুনির্দিষ্ট যন্ত্র ছিল না— যে যন্ত্রটাই হল রাষ্ট্রযন্ত্র।

আদিম সমাজে যখন মানুষ পারিবারিক ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বাস করত, এবং অগ্রগতির একেবারে নিম্নস্তরে, বলতে গেলে প্রায় বর্বর যুগে ছিল— যে যুগটি আধুনিক সভ্য মানব সমাজ থেকে বহু হাজার বছরের পুরনো, সেখানেও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। আমরা সে সময় দেখতে পাই আচার-রীতির (কাস্টম) প্রাধান্য, কর্তৃত্ব, শ্রদ্ধা, গোষ্ঠীর প্রবীণদের হাতে ক্ষমতা। আমরা দেখতে পাই এই ক্ষমতা কখনও কখনও নারীর হাতেও ন্যস্ত ছিল। সেই সময় নারীর অবস্থান আজকের মতো নিম্নস্তরে এবং অবদমিত ছিল না। কিন্তু সে সময় কোথাওই দেখা যায়নি যে, একটি বিশেষ ধরনের জনগোষ্ঠী, যারা অন্যদের থেকে পৃথক এবং তাদের হাতে রয়েছে সুসংহতভাবে ও স্থায়ী রূপে শাসন চালাবার জন্য এক ধরনের দমনযন্ত্র, সশস্ত্র দমনযন্ত্র। এ জিনিস তখন ছিল না, যেটা আজ আপনারা দেখতে

পান সশস্ত্র সেনাবাহিনী, কয়েদখানা সহ অপরের ইচ্ছাকে জোর করে দমন করবার আরও নানা উপায়ের অস্তিত্বের মধ্যে।

যদি আমরা তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা, তার নানা সূক্ষ্ম বিষয়, দর্শনগত যুক্তিধারা এবং বুর্জোয়া পণ্ডিতদের নানা মতের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি, এবং আলোচ্য বিষয়ের নির্যাস বোঝার চেষ্টা করি তা হলে আমরা দেখব যে, রাষ্ট্র হল বাস্তবেই শাসন চালাবার এমন একটি হাতিয়ার, যাকে মানসবসমাজ থেকে পৃথক করে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মানব সমাজে যখন এরকম এক বিশেষ জনগোষ্ঠী তৈরি হল যাদের কাজ হল কেবল শাসন করা, অন্য কিছু নয়, তখন শাসনের জন্য দমনপীড়নের বাহিনী, অন্যের ইচ্ছা দমনের বাহিনী, জেলখানা, মানুষদের নিয়ে একটা বিশেষ বাহিনী, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি তাদের প্রয়োজন হল। তখনই উৎপত্তি হল রাষ্ট্রের।

কিন্তু এমন সময় ছিল যখন কোনও রাষ্ট্র ছিল না। তখন সাধারণভাবে সামাজিক সংহতি, শৃঙ্খলা এবং কাজ ইত্যাদি পরিচালিত হত লোকাচার ও ঐতিহ্যের শক্তির দ্বারা, কর্তৃপক্ষ বা গোষ্ঠীর যারা প্রবীণ, যারা শ্রদ্ধার পাত্র ছিল, বা মহিলা, যারা সেই সময় প্রায়ই পুরুষের সমান মর্যাদা পেত শুধু তাই নয়, কখনও কখনও পুরুষের চেয়ে বেশি মর্যাদা উপভোগ করত, তাদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং তখন শাসনের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ ধরনের ব্যক্তি ছিল না। ইতিহাস দেখায়, দমন পীড়নের বিশেষ ধরনের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হল তখনই, যখন সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হল। অর্থাৎ একটি শ্রেণি তৈরি হল যারা স্থায়ীভাবে অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার জায়গায় এসে গেল, যেখানে কিছু মানুষ অন্যদের উপর শোষণ চালাল।

বিভিন্ন শ্রেণিতে সমাজের এই বিভাজন, মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের একটি মৌলিক ঘটনা। হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত দেশে সমস্ত মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে ব্যতিক্রমহীনভাবে একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায়, নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ধারা প্রতিভাত হয়, যার জন্য আমরা দেখি শুরুতে সমাজটা ছিল শ্রেণিহীন। শুরুর দিকের পিতৃতান্ত্রিক, আদিম সমাজে কোনও অভিজাত শ্রেণি ছিল না। পরে দাসত্বকে ভিত্তি করে এক সমাজ এল, দাসদের উপর মালিকানার সমাজ। আধুনিক সভ্য ইউরোপ এই স্তরের মধ্য দিয়েই এসেছে। দুই হাজার বছর আগে ছিল দাসপ্রভুদের নিরঙ্কুশ শাসন। বিশ্বের অন্যান্য অংশের বিশাল জনগণও এই স্তরের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করেছে। অনুন্নত জনজাতির মধ্যে আজও এই দাসত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্তমানে আফ্রিকায় আপনারা এই দাসত্বের প্রতিষ্ঠান দেখতে পাবেন। দাসমালিক এবং দাস— এটাই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি বিভাজন। সে সময় জমি এবং উৎপাদন যন্ত্র যত অনুন্নত এবং আদিম প্রকৃতির হোক না কেন,

দাসমালিকরা শুধু সেগুলিরই মালিক ছিল না, সমগ্র জনগণেরও মালিক ছিল। এদের বলা হত দাসপ্রভু, আর যারা অন্যের জন্য শ্রম দেয় তাদের বলা হত দাস।

এই রূপই দেখা গেল সামন্ত্রতন্ত্রে। অধিকাংশ দেশে দাসপ্রথা বিকাশের পথে সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথায় রূপান্তরিত হয়। সমাজের মৌলিক বিভাজনটা দাঁড়ায় সামন্ত জমিদার এবং ভূমিদাস। দুই শ্রেণির জনগণের মধ্যে সম্পর্ক পাল্টে যায়। দাসপ্রভুরা দাসদের মনে করত তাদের সম্পত্তি। আইন একেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেখিয়েছে যে দাসরা প্রভুদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পত্তি। ভূমিদাসদের ক্ষেত্রে শ্রেণি অত্যাচার ও অধীনতা থাকল, কিন্তু ভূমিদাসরা জমিদারদের সম্পত্তি রূপে গণ্য হল না। জমিদারদের কেবল ভূমিদাসদের শ্রমের উপর অধিকার ছিল। কিন্তু আপনারা জানেন, রাশিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা ভূমিদাস ব্যবস্থার সঙ্গে পুরনো দাসব্যবস্থার কার্যত কোনও পার্থক্য ছিল না।

শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার, বিশ্ববাজারের আবির্ভাব, ও টাকাকড়ির ব্যাপক চলাচল শুরু হওয়ার সাথে সাথে সামন্তী সমাজের মধ্যে একটা নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, সেটি হল পুঁজিপতি শ্রেণি। পণ্য ও পণ্যবিনিময় থেকে গড়ে ওঠে টাকাকড়ির শক্তি, আর তা থেকে গড়ে ওঠে পুঁজির শক্তি। অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে দুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লব ঘটে যায়। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ হয়। সর্বশেষে বিপ্লব ঘটে রাশিয়ায়। ১৮৬১ সালে রাশিয়ায় একটা দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটে যার ফলে এক ধরনের সমাজব্যবস্থার বদলে আসে আর এক ধরনের সমাজ। পুঁজিবাদ এসে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু সেখানেও শ্রেণি থেকে যায়, পুরনো ভূমিদাসত্বের নানা জের ও অবশেষ থেকে যায়। কিন্তু নতুন সমাজে শ্রেণিবিভেদ মৌলিকভাবে নতুন রূপ গ্রহণ করে।[১]

সকল পুঁজিবাদী দেশের পুঁজির মালিকেরা, জমির মালিকেরা, কলকারখানার মালিকেরা সেদিনও অত্যন্ত মুষ্টিমেয় ছিল, আজও তাই। অথচ তারাই সমস্ত জনগণের শ্রমের ওপর আধিপত্য করে, এই আধিপত্যের জোরে শোষণ ও নির্যাতন করে। শোষিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ হল সর্বহারা মজুরি শ্রমিক, যারা তাদের জীবনধারণের উপকরণগুলি সংগ্রহের জন্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রমের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে। সমাজের পুঁজিবাদে উত্তরণের পর চাষিরা, যারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অসংগঠিত ও নিপীড়িত ছিল তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সর্বহারায় পরিণত হয়, আর ক্ষুদ্র একটা অংশ পরিণত হয় ধনী চাষিতে, যারা আসলে গ্রামীণ বুর্জোয়া, তারা মজুরি দিয়ে কৃষিশ্রমিক খাটায়।

আপনাদের যে মৌলিক কথাটা স্মরণে রাখতে হবে, তা হল, ইতিহাসের সকল পর্যায়ে, বিশ্বের শত শত দেশে আবির্ভূত বহু ধরনের রাজনৈতিক তত্ত্বকে

দাসসমাজ থেকে ভূমিদাসভিত্তিক সমাজ ও তারপর পুঁজিবাদ এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে বুঝলেই আপনারা সেগুলি বুঝতে পারবেন। শত শত বছর ধরে সমাজের বহুবিধ রাজনৈতিক রূপান্তর বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা ঘটেছে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের পরে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণার অবতারণা করেছেন, সমাজের অন্ধিসন্ধি বিচার করে যেসব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বহু বিষয়ে মতামত দিয়েছেন, সেগুলিকে সমাজের শ্রেণিবিভক্তি ও শ্রেণি শাসনের পরিবর্তনের কষ্টিপাথরে ফেলে আপনাদের বুঝতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনের এই মৌলিক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে যদি বিচার করা যায়, তবে দেখা যাবে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার আগে রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু সমাজ যখন শ্রেণিবিভক্ত হয়, শ্রেণিবিভাগ পাকাপোক্ত রূপ নিয়ে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠে তখনই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে ও তা পাকাপোক্ত রূপ নেয়। মানব ইতিহাসে আমরা জানি শত শত দেশ দাস ব্যবস্থা, সামন্তী সমাজ ও পুঁজিবাদ—পরিবর্তনের এই ধারায় চলেছে বা আজও চলছে। এসব দেশে বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে, বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে, মানবসমাজের বিকাশের পথে দাস সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্র হয়ে পুঁজিবাদ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম সংগ্রামের মধ্যে আপনারা সর্বদাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখতে পাবেন। রাষ্ট্র হল একটা যন্ত্র যা সমাজ থেকে আলাদা একদল লোক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বদা অথবা প্রায় সবসময়ে প্রজাশাসনের কাজ করে থাকে। মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল হয় শাসিত আর একদল হয় বিশেষজ্ঞ প্রশাসক, এঁরা সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে যায় ও এদের শাসক বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলা হয়।

দাস সমাজে আদিম যুগের গদাই হোক বা মধ্যযুগে আবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্রই হোক বা উনিশ শতকে আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি আধুনিকতম অস্ত্রই হোক, এই রাষ্ট্রযন্ত্রটি অথবা প্রশাসকরা সর্বদাই একটা উৎপীড়নের যন্ত্র বা দানবিক শক্তিতে সজ্জিত থাকে। নির্যাতনের অস্ত্রটা বদলাতে পারে কিন্তু যতদিন রাষ্ট্র থাকবে, হুকুম জারি করার জন্য একদল শাসক থাকবে, ততদিন তাদের হাতে সেই সেই সমাজের আধুনিকতম প্রযুক্তির নির্যাতনের অস্ত্র থাকবে। এই সাধারণ সত্যটাকে মনে রেখে যদি আমরা প্রশ্ন করি তা হলেই বুঝতে পারব কেন শ্রেণির উদ্ভবের সাথে সাথে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং সমাজে যখন শ্রেণি ছিল না, শোষক শোষিতে মানুষ বিভক্ত ছিল না তখন কেন রাষ্ট্র ছিল না। তখনই রাষ্ট্রের সার কথা এবং তাৎপর্য আমরা ধরতে পারব। রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণির হাতে অপর শ্রেণির ওপর

আধিপত্য কায়েম করার যন্ত্র।

দাস সমাজ তৈরি হওয়ার আগে শ্রেণিবিভাগ ছিল না, মানুষ অনেকটা সাম্যের পরিবেশে কাজ করত, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল অতীব কম, কোনও রকমে বেঁচে থাকার উপাদানগুলি তারা জোগাড় করতে পারত, সেই পরিবেশে একদল লোকের পক্ষে নিজেদের আলাদা করে নিয়ে বাকিদের শাসন করা বা তাদের ওপর আধিপত্য করার মতো অবস্থাই তখন তৈরি হয়নি। আদিম ধরনের কৃষি থেকে যখন বাকিদের প্রাণটুকু কোনও মতে ধরে রাখার উপাদান রেখে সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা সম্ভব হল, তখন সেই উদ্বৃত্তটি দখল করল দাসপ্রভুরা— এইভাবে তৈরি হল দাসপ্রভুর দল। তাদের আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করার জন্য দরকার হল রাষ্ট্রের। গড়ে উঠল রাষ্ট্র— যে রাষ্ট্র দাসপ্রভুদের হাতে ক্ষমতা দিল দাসদের শায়েস্তা করে বশে রাখার। সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল আজকের তুলনায় অনেক ছোট। সেই রাষ্ট্রের হাতে যোগাযোগের মাধ্যমও ছিল আজকের তুলনায় নগণ্য। যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমের অস্তিত্বই তখন ছিল না। পর্বত, সমুদ্র, নদী ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, তাই রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমায় গড়ে উঠেছিল। তুলনায় দুর্বল রাষ্ট্রযন্ত্র তার ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ ক্ষুদ্র সমাজকে শাসনে রাখত। যাই হোক, রাষ্ট্র যন্ত্রটা তখন ছিল, যা দাসেদের দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকতে বাধ্য করত, মানবসমাজের এক অংশের দ্বারা অপর অংশের ওপর দমনপীড়ন চালাত। দমনপীড়নের স্থায়ী যন্ত্র না থাকলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অপর একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করা যায় না। তাই যতদিন শ্রেণি ছিল না, ততদিন রাষ্ট্রযন্ত্রও ছিল না। যখন সর্বত্র এই বৈষম্য বাড়তে লাগল এবং শিকড় গেড়ে বসতে লাগল তখনই বিশেষ ধরনের যন্ত্র, রাষ্ট্র যন্ত্রের উদ্ভব ঘটল। উন্নত এবং সভ্যজগতে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রের রূপ হল নানা রকম। যেমন প্রাচীন গ্রিস ও রোম ছিল পুরোপুরি দাসশ্রমনির্ভর। সেই সময়েই রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের রূপভেদ দেখা গিয়েছিল। রাজতন্ত্রে সকল ক্ষমতা ছিল একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। আবার প্রজাতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি নয় এমন কারও হাতে ক্ষমতা ছিল না। অভিজাততন্ত্রে ক্ষমতা ছিল তুলনামূলকভাবে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে, আবার গণতন্ত্রে ক্ষমতা ছিল জনগণের (গ্রিক ভাষায় ডেমোক্রেসি মানে হল জনগণের শাসন)। এই সকল পার্থক্যই দেখা দিয়েছিল দাস সমাজে। পার্থক্য যাই হোক দাস সমাজ ছিল দাসতন্ত্রের দ্বারা শাসিত, তা সে রাষ্ট্রের রূপ রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক যা-ই হোক না কেন।

প্রাচীন ইতিহাসের উপর যে-কোনও আলোচনায় আপনারা রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে লড়াইয়ের কথা শুনবেন কিন্তু মূল কথাটা মনে রাখবেন,

কোথাওই দাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হত না। তারা নাগরিক হিসাবে শুধু গণ্য হত না তাই নয়, তাদের মানুষই ভাবা হত না। রোমের আইন তাদের ভেড়ার পাল মনে করত। মানুষকে রক্ষার জন্য অন্য সব আইনগুলো দাসদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ দূরে কথা, এমনকী নরহত্যার বিরুদ্ধে আইনও দাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। এই আইন শুধু দাসপ্রভুদের রক্ষা করত, একমাত্র তারাই ছিল সব অধিকারের অধিকারী পূর্ণ নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যাই হোক, তা ছিল দাস প্রভুদের রাজতন্ত্র বা দাস প্রভুদের প্রজাতন্ত্র। দুই ধরনের রাষ্ট্রেই দাসপ্রভুরা সমস্ত অধিকার ভোগ করত। আইনের চোখে দাসরা ছিল গবাদি পশুর মতো, দাসদের উপর যে কোনও ধরনের নৃশংস আচরণ করা যেত। একজন দাসকে হত্যা করা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হত না। দাসপ্রভুদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিক থেকে পার্থক্য ছিল, সেখানে অভিজাত প্রজাতন্ত্র ছিল, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল। অভিজাতদের প্রজাতন্ত্রে খুব সামান্য সংখ্যক সুবিধাভোগী মানুষ নির্বাচনে অংশ নিত, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সকলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারত, কিন্তু এই সকলেই মানে শুধু দাস প্রভুরা, অর্থাৎ দাসদের বাদ দিয়ে বাকি সকলেই। এই মূল কথাটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, কারণ রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে এই বৈশিষ্ট্যই অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি লক্ষ্য করতে হবে, যা রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে দেখাবে।

রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণির হাতে অপর শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র, অধীনস্থ শ্রেণিগুলোকে আনুগত্যের বন্ধনে রাখার হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের নানাবিধ রূপ আছে। দাসপ্রভুদের রাষ্ট্রে আমরা রাজতন্ত্র, অভিজাত প্রজাতন্ত্র বা এমনকী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল। বস্তুত সরকার বা প্রশাসনের রূপটা বিভিন্ন ধরনের ছিল কিন্তু তার সারবস্তু ছিল সবসময় একই— দাসেরা কোনও অধিকার ভোগ করত না এবং তারা ছিল একটি নির্যাতিত শ্রেণি, তারা মানুষ হিসাবে বিবেচিত হত না। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিস দেখতে পেয়েছি।

শোষণের রূপ পরিবর্তনের পথে দাসপ্রভুদের রাষ্ট্র রূপান্তরিত হয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে। দাসব্যবস্থায় দাসদের কোনও অধিকার ছিল না এবং মানুষ বলে তারা বিবেচিত হত না; সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকরা জমিতে বাঁধা পড়ল। ভূমিদাস ব্যবস্থার প্রধান চিহ্ন ছিল— কৃষকরা জমির সাথে বাঁধা পড়ল (সে সময় কৃষকরাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল; শহরের জনসংখ্যা ছিল খুব নগণ্য)। জমি বা ভূমির সঙ্গে বাঁধা বলেই ভূমিদাস— এ ভাবেই ভূমিদাস ধারণার জন্ম হয়। জমিদার ভূমিদাসের জন্য জমির অংশ নির্দিষ্ট করে দিত, যে জমিতে সে নিজের প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন কাজ করত। বাকি দিনগুলিতে ভূমিদাসকে তার প্রভুর

জন্য কাজ করতে হত।

এভাবেই সামন্তী ব্যবস্থাতেও শ্রেণিসমাজের মর্মবস্তুটা থেকেই গেল, সমাজের ভিত্তিতেও থাকল শ্রেণিশোষণ। ভূস্বামীরাই শুধু পরিপূর্ণ অধিকার ভোগ করত, কৃষকদের কোনও অধিকার ছিল না। দাসব্যবস্থায় দাসদের অবস্থার তুলনায় বাস্তবে ভূমিদাসদের অবস্থার পার্থক্য ছিল নগণ্য, তবে যেহেতু কৃষক-ভূমিদাসরা জমির মালিকদের প্রত্যক্ষ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হল না, তাই তা ভূমিদাসদের, কৃষকদের শোষণ মুক্তির পথকে উন্মুক্ত করেছিল। সে তার নিজের সময়ের একটা অংশ তার নিজের বলতে যে জমিটুকু ছিল, তাতে কাজ করতে পারত। সামন্তী সমাজের অভ্যন্তরে বিনিময় ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের অগ্রগতির সুযোগ বাড়ার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ভাঙতে থাকল এবং কৃষক-মুক্তির সম্ভাবনাও ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেল। দাসব্যবস্থার তুলনায় সামন্তীব্যবস্থা সবসময়ই বেশি জটিল ছিল। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য ছিল এবং শিল্পের বেশ ভাল অগ্রগতি ঘটে, যা এমনকী সেই যুগেও সমাজকে পুঁজিবাদের দিকেই নিয়ে গেল। মধ্যযুগে সামন্তী ব্যবস্থারই প্রাধান্য ছিল। এখানেও রাষ্ট্রের বিবিধ রূপ দেখা যায়। এখানেও আমরা রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র দুই-ই দেখতে পাই, যদিও প্রজাতান্ত্রিক রূপের প্রকাশ ছিল খুব দুর্বল। কিন্তু সর্বদা সামন্তী জমিদারকেই একমাত্র প্রশাসক হিসাবে বিবেচনা করা হত। কৃষক-ভূমিদাস প্রজারা ছিল সবধরনের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

দাস ব্যবস্থা হোক বা সামন্তী ব্যবস্থা, কোনও ব্যবস্থাতেই মুষ্টিমেয় মানুষ দমন-পীড়ন ছাড়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অধীনে রাখতে পারত না। নিপীড়ন উৎখাত করার জন্য নিপীড়িত শ্রেণিগুলির ক্রমাগত প্রচেষ্টার অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইতিহাস পূর্ণ। দাসব্যবস্থার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় বহু দশক ধরে চলতে থাকা দাসত্ব থেকে মুক্তিযুদ্ধের রেকর্ড। ঘটনাচক্রে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এখন 'স্পার্টাসিস্ট' নাম নিয়েছে— এটাই জার্মানির একমাত্র পার্টি যে সত্যসত্যই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এরা এই নাম গ্রহণ করেছে কারণ দু'হাজার বছর আগে দাসদের বিরাট বিরাট বিদ্রোহগুলির নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাতদের একজন হলেন স্পার্টাকাস। দাস ব্যবস্থার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আপাত সর্বশক্তিমান রোমান সাম্রাজ্যের ওপর স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সশস্ত্র এবং ঐক্যবদ্ধ বিশাল দাসবাহিনীর বিদ্রোহের আঘাত এসে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত তারা পরাজিত হয়, বন্দী করা হয় তাদের। তারা অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসে এই ধরনের বহু গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে আছে। আমি কেবল দাসতন্ত্রের যুগের সবচেয়ে বড় গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করেছি। তেমনই

সামন্ততন্ত্রের সমগ্র যুগ ধরে ছড়িয়ে আছে ক্রমাগত চাষি অভ্যুত্থানের ঘটনা। যেমন, মধ্যযুগে জার্মানিতে জমিদার এবং ভূমিদাস এই দুই শ্রেণির সংগ্রাম বিশাল আকার ধারণ করেছিল এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়াতেও সামন্তী জমিদারদের বিরুদ্ধে বারংবার একই ধরনের কৃষক অভ্যুত্থানের কথা আপনারা সকলেই জানেন।

ভূস্বামীদের আবশ্যিকভাবেই একটি হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়েছিল, যাতে তারা শাসনব্যবস্থা বহাল রেখে ও নিজেদের ক্ষমতার উপর দখল রেখে, নিজেদের অধীনে এক বিরাট সংখ্যক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে কিছু আইন ও নিয়মনীতি মানতে তাদের বাধ্য করতে পারে। এই ধরনের সকল আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ভূমিদাস কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের শাসন করার ক্ষমতা বহাল রাখা। এই ছিল সামন্তী রাষ্ট্র, যা রাশিয়াতেই হোক অথবা যথেষ্ট পিছিয়ে থাকা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে আজও সামন্ততন্ত্র রয়েছে, সেখানেই হোক— রূপভেদে কোথাও ছিল তা প্রজাতান্ত্রিক অথবা কোথাও রাজতান্ত্রিক শাসন। রাষ্ট্রটা যেখানে রাজতান্ত্রিক সেখানে একজন ব্যক্তি কর্তৃক শাসনই ছিল স্বীকৃত, আর প্রজাতন্ত্রে ছিল কোনও না কোনওভাবে জমিদার সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন স্বীকৃত। এই হল সামন্তী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রূপ। সামন্ততন্ত্রে সমাজ ছিল শ্রেণিবিভক্ত, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাস কৃষক পুরোপুরি নগণ্য মুষ্টিমেয় জমিদার বা জমির মালিকের অধীন ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি, পণ্য বিনিময়ের অগ্রগতিকে ঘিরে একটি নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে— তা হল, পুঁজিপতি শ্রেণি। মধ্যযুগের শেষ দিকে আমেরিকা আবিষ্কারের পর যখন দামী ধাতুর পরিমাণ বেড়ে যায়, বিশ্ববাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সোনা এবং রূপা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণত হয়, যখন আর্থিক লেনদেনের ফলে ব্যক্তির পক্ষে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয়, তখন পুঁজির উদ্ভব ঘটে। সোনা এবং রূপা সারা বিশ্ব জুড়ে সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। জমিদার শ্রেণির অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমতে থাকে এবং পুঁজির অধিকারী নতুন শ্রেণির ক্ষমতা বাড়তে থাকে। সমাজের পুনর্গঠন এমনভাবে ঘটল, যাতে মনে হল, সকল নাগরিকই সমান, দাসপ্রভু এবং দাসদের পুরনো বিভাজন দূর হয়ে গেল, যে যত পুঁজিরই মালিক হোক না কেন আইনের চোখে সকলেই সমান বলে পরিগণিত হল। কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে জমির মালিক হোক, অথবা কারও ক্ষেত্রে নিজের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য আর কিছুই না থাকুক— আইনের চোখে সবাই সমান। আইন সকলকেই সমানভাবে রক্ষা করে;শ্রমক্ষমতা বিক্রি করা ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই, যারা ধীরে ধীরে নিঃস্ব, ধ্বংস হয়ে

সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে তাদের আক্রমণ থেকে সম্পত্তির মালিকদের রক্ষা করার জন্য আইন কাজ করে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ।

এ বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা আমি করব না। পার্টির কর্মসূচি যখন আপনারা আলোচনা করবেন তখন পুঁজিবাদী সমাজের বর্ণনা পাবেন। স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে এই সমাজ ভূমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়েছে, পুরনো সামন্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা বা লিবার্টি হচ্ছে যারা সম্পত্তির মালিক শুধু তাদের জন্যই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন সামন্ততন্ত্র ভাঙল, রাশিয়াতে ভেঙেছিল অন্যান্য দেশের পরে ১৮৬১ সালে, তখন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাতিল করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এল, এই রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতার স্লোগান দেয়, সকলের ইচ্ছাকে রূপায়িত করার কথা ঘোষণা করে এবং এটিও যে একটি শ্রেণিরাষ্ট্র তা অস্বীকার করে। এই পর্যায়ে সমাজতন্ত্রী, যারা সকল মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংগ্রাম দেখা দিল— যে সংগ্রামের পরিণতিতেই বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। এই সংগ্রাম সমস্ত বিশ্ব জুড়েই চলছে।

বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাকে বুঝতে হলে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সারমর্মকে বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সংগ্রাম শুরু করেছিল লিবার্টি বা স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে। সামন্ততন্ত্রের অবসানের অর্থ দাঁড়াল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের জন্য স্বাধীনতা। ভূমিদাস ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময় কৃষকরা জমির পুরো মালিক হওয়ার সুযোগ পেল; এই জমি তারা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্রয় করেছিল। সেটা যেভাবে ঘটে থাকুক না কেন, তা নিয়ে রাষ্ট্রের কোনও মাথাব্যথা ছিল না; সম্পত্তির উৎস যাই হোক না কেন, সম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ, কারণ, রাষ্ট্রটি ব্যক্তিসম্পত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সকল আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রে কৃষকরাই ব্যক্তিমালিক হয়ে গেল। এমনকী জমিদাররা যখন তাদের জমির খানিকটা কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে, তখনও রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তিকেই রক্ষা করেছে, ভূমিস্বামীদের ক্ষতিপূরণের টাকা বা জমি বিক্রির টাকা দিয়েছে। ব্যক্তিসম্পত্তিকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করবে বলে রাষ্ট্র শপথবদ্ধ এবং সেই অনুযায়ী সে ব্যক্তিসম্পত্তিকে সমর্থন এবং রক্ষা করবেই। রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কারখানা মালিকের সম্পত্তির অধিকারকে মর্যাদা দেয়। ব্যক্তিসম্পত্তি পুঁজির ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তিহীন কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে পুরোপুরি অধীনস্থ রাখার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ বলে যে স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পুঁজিবাদ সম্পত্তির স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিল এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেন আর পূর্বেকার

রাষ্ট্রের মতো একটি শ্রেণিরাষ্ট্র নেই— এ কথা ঘোষণা করতে বিশেষ গর্ব বোধ করেছিল।

তাদের এই ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে পুঁজিপতিরা যাতে গরিব চাষি এবং শ্রমিক শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখতে পারে এই রাষ্ট্রও সেই ধরনেরই একটি যন্ত্র। কিন্তু বাইরের দিক থেকে চেহারায় এই রাষ্ট্র মুক্ত বলে মনে হয়। এই রাষ্ট্র সার্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করেছে। পুঁজিবাদের ঘোর সমর্থক, প্রচারক, পুঁজিবাদী পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মাধ্যমে এরা ঘোষণা করায়, এটি শ্রেণি রাষ্ট্র নয়। এমনকী এখনও, যখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, তখন তারা অভিযোগ আনছে, আমরা নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করছি, দমনপীড়ন করার ভিত্তিতে নাকি আমরা রাষ্ট্র গড়ে তুলছি, এখানেও কিছু মানুষ অন্যদের দ্বারা অবদমিত হচ্ছে, আর তারা নাকি জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করছে। এখন যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব শুরু হয়েছে এবং কিছু দেশে তা সদ্য সফল হয়েছে, বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই বিশেষভাবে তীব্র হয়েছে তখন রাষ্ট্রের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কেউ এভাবেও বলতে পারে বর্তমানের সকল রাজনৈতিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু, সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

রাশিয়া সহ অন্য যে কোনও সভ্য দেশের দিকে যদি তাকাই তা হলে দেখব, সমস্ত দলের সকল বিরোধের মূল বিরোধ হল রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করে। সুইজারল্যান্ড বা আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী দেশে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু আছে তা কি অবাধ গণতন্ত্র? তার মধ্যে কি জনগণের ইচ্ছার সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে? সেখানে কি জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখা যায়? নাকি তা সেই সেই দেশের পুঁজিপতিদের হাতের যন্ত্র যার জোরে তারা শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর আধিপত্য জারি রাখে। বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক বিরোধ এই মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

বলশেভিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের মতামত কী? বুর্জোয়া সংবাদপত্র বলশেভিকদের সম্পর্কে নিন্দামন্দ করে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বারবার ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে বলে চলে যে, বলশেভিকরা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শাসন করে। যদি আমাদের মেনশেভিক ও সোসালিস্ট রেভলিউশনারিরা সরল হৃদয়ে (হয় এটা মোটেই সরলতা নয়, নয়ত তেমন সরলতা যা জটিলতার চেয়েও ভয়ঙ্কর) বিশ্বাস করে যে, বলশেভিকরা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। এসব অভিযোগ তাদের নিজেদের আবিষ্কার, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের বিরাট বিরাট ধনী সংবাদপত্র, যারা বুর্জোয়াদের তৈরি মিথ্যা প্রচার করার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করে লক্ষ লক্ষ কপি ছাপায় ও লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তা বণ্টন করে, তাদের কেউই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করতে ছাড়ে না। তারা বলে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশে জনগণের স্বার্থে শাসন পরিচালিত হয়, কিন্তু বলশেভিক রাষ্ট্র ডাকাত, তারা মানবাধিকারের তোয়াক্কা করে না। দেশ শাসন যে জনস্বার্থে করা উচিত— বলশেভিকরা এই ধারণা নিয়ে চলে না, তারা এতদূর নেমেছে যে, সংবিধান রচনার গণপরিষদ পর্যন্ত তারা ভেঙে দিয়েছে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অভিযোগ সারা দুনিয়ায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের জবাবে আমাদের বলতেই হচ্ছে— আমাদের দাঁড়াতে হবে দৃঢ় উপলব্ধির ওপর। অপরের মুখে ঝাল না খেয়ে, এই মিথ্যা অভিযোগের প্রকৃত জবাব কী, তা বুদ্ধিপূর্বক বুঝে নেওয়ার জন্যই আমাদের জানতে হবে— রাষ্ট্র কী? আমাদের সামনে রয়েছে নানা ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার সমর্থনে রয়েছে নানা কিসিমের তত্ত্ব যা মহাযুদ্ধের আগেই তৈরি হয়েছে। উত্থাপিত অভিযোগের সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য এই সব তত্ত্ব ও মতামত আমাদের খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

আপনাদের আগেই আমি বলেছি, এঙ্গেলসের 'দি ওরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট' বইটা পড়তে। সেই বইতে বলা আছে, যে রাষ্ট্রে জমি ও উৎপাদনের হাল হাতিয়ারের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, যে রাষ্ট্রে পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, তা দেখতে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, তা হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের হাতে হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা শ্রমিক শ্রেণি, গরিব চাষিদের নিজেদের অধীনে বেঁধে রাখে। সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণপরিষদ, সংসদ এগুলি নিছক বহিরঙ্গের রূপ, অনেকটা প্রতিশ্রুতিপত্রের মতো, এর দ্বারা রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের কিছু রদবদল হয় না।

রাষ্ট্রের দমনমূলক বহিরঙ্গ রূপটা নানা রকম হতে পারে। পুঁজির রূপটা যেখানে একরকম সেখানে একভাবে তার ক্ষমতা প্রকট হতে পারে, যেখানে রূপটা অন্য রকম সেখানে তার ক্ষমতার প্রকাশটা ভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হল ক্ষমতাটা থাকে পুঁজির হাতে। সেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে কি না, প্রজাতন্ত্রের রূপটা গণতান্ত্রিক কি না এটা বড় কথা নয়। বরং যে রাষ্ট্র যত গণতান্ত্রিক সেখানে পুঁজিবাদী শাসনটা তত প্রচ্ছন্নভাবে প্রকট (ক্রুড), তত বেশি গণঅনীহা নির্ভর (সিনিক)। বিশ্বের সবচেয়ে উদার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সেখানে পুঁজির শাসন, মুষ্টিমেয় শত কোটিপতির শাসন সবচেয়ে প্রকট এবং খোলাখুলি দুর্নীতিতে সে দেশ আকণ্ঠ নিমগ্ন। ১৯০৫ সালের পর যারাই

সে দেশে গেছে তারাই এর সাক্ষ্য দেবে। একবার যে সমাজে পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সে গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র যাই হোক, সেই সমাজে ভোটাধিকারের প্রসার যতই ঘটানো হোক, তার দ্বারা মূল চরিত্রের বদল হয় না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বা সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন করা একটা বিরাট অগ্রগতি। কারণ গণতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকরা বর্তমান সংহতি ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম করে চলেছে। দাস সমাজের লড়াইয়ের কথা বাদই দিলাম, এমনকী ভূমিদাসদের লড়াইয়ের সঙ্গেও এর কোনও তুলনা হয় না।

আমরা জানি দাসেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছে, কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষকে শ্রেণিসচেতন পার্টিতে সংগঠিত করতে পারেনি, যে পার্টি লড়াই পরিচালনা করতে পারে। তাদের সামনে লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল না। তাই ইতিহাসের বহু বৈপ্লবিক মুহূর্তে দাসেরা সর্বদা শাসকদের হাতের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবসমাজের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, সংসদ, সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন ইত্যাদি অগ্রগতির পথে বড় পদক্ষেপ। মানবসমাজের অগ্রগতির পথেই এসেছে পুঁজিবাদ। একমাত্র পুঁজিবাদে এসেই শহর-সভ্যতার কল্যাণে শোষিত সর্বহারা নিজেকে চিনতে শিখেছে, নতুন সমাজ গড়ার কথা ভেবেছে, বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিয়ে গড়ে তুলেছে সর্বহারা পার্টি— সমাজতান্ত্রিক দল যারা জনগণের সংগ্রামকে সচেতনভাবে পরিচালিত করতে জানে। সংসদীয় ব্যবস্থা ছাড়া, নির্বাচনের ব্যবস্থা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির এই বিকাশ সম্ভব ছিল না। এই কারণেই ব্যাপক জনগণের দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই যে-কোনও প্রগতিশীল ব্যবস্থা অর্জন করা এত কঠিন। এজন্যই পাকা ঠগবাজরা শুধু নয়, বিজ্ঞানীরা, পুরোহিতেরাও বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রচারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, রাষ্ট্র হল স্বাধীন এবং সকল জনগণের স্বার্থরক্ষাই তার লক্ষ্য। এই কারণেই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অন্তর থেকে পুরনো ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরনো পুঁজিবাদী সমাজের বদলে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনের তাৎপর্য ধরতে পারে না। এদের মধ্যে যারা আছে তারা পুঁজি মালিকদের কৃপাধন্য জনগণ নয়, পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট জনগণও শুধু নয়, পুঁজিপতিদের দেওয়া ঘুষের টাকায় পুষ্ট জনগণ নয় (বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী, শিল্পী, পুরোহিত আছে যারা পুঁজির সেবায় নিযুক্ত)। এমন লোকও আছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা যাঁদের কুসংস্কারের মতো পেয়ে বসেছে, এঁরা সবাই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই খড়্গহস্ত, কারণ প্রতিষ্ঠালগ্নেই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে

দিয়ে বলেছে— তোমরা বল তোমাদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা অবাধ কিন্তু যতদিন ব্যক্তিসম্পত্তি থাকবে ততদিন তোমার এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটি যতই স্বাধীনতার বড়াই করুক তা শ্রমিকদের দমনের জন্য পুঁজিপতিদের হাতে হাতিয়ার, তার আপাত চেহারাটি যত অবাধ, ততই তার দমনমূলক চরিত্রটি প্রকট। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যতই পালিশ চড়িয়ে এদের সুন্দর করে দেখানো হোক, শ্রমিকের গণতন্ত্র, জনগণের সমানাধিকারের কথা যত জোর গলায় বলা হোক না কেন, ব্যাপক জনগণের ভালমন্দের তোয়াক্কা না করে পুঁজির এমন নির্মম খোলাখুলি শাসন দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। যদিও নামে এরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বাস্তব হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডে রয়েছে পুঁজির শাসন। এখানে শ্রমিক যদি তার জীবনমানের সামান্য উন্নতি ঘটানোর দাবি করে তা হলেই গৃহযুদ্ধ চাপানো হয়। এইসব দেশে সেনাবাহিনীতে লোক কম। সুইজারল্যান্ডে একটা মিলিশিয়া আছে, আবার প্রত্যেক সুইস নাগরিক ঘরে বন্দুক রাখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি সাম্প্রতিককালের আগে স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। তাই শ্রমিক আন্দোলন হলেই এখানকার বুর্জোয়ারা অস্ত্র সংগ্রহ করে, ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করে শ্রমিক আন্দোলন দমন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সুইজারল্যান্ডে যত নির্মমভাবে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হয় তেমনভাবে দুনিয়ায় আর কোথাও হয় না। আবার এখানকার সংসদে পুঁজির প্রভাব যত তীব্র তেমনটি দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। পুঁজি এখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, শেয়ারবাজার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদ, নির্বাচন এ সবই তাদের হাতের পুতুল। যদিও এখানকার শ্রমিকদের চোখ ক্রমশ খুলে যাচ্ছে। সম্প্রতি যে গণহত্যার পর্যায় আমরা পার হয়ে এলাম তারপর সোভিয়েট সরকারের ধারণা ক্রমশ ব্যাপকতর হচ্ছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালানো যে জরুরি তা শ্রমিক শ্রেণির কাছে দিনে দিনে স্পষ্ট হচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে ছদ্মবেশই ধারণ করুক, তা যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, তা যদি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়, যদি সেই রাষ্ট্রে জমি ও কলকারখানার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা জারি থাকে, যদি সেই রাষ্ট্রে পুঁজি গোটা সমাজকে মজুরি-দাসত্বে বেঁধে রাখে, আমাদের দল ও সোভিয়েট সংবিধানে ঘোষিত নীতিগুলি যদি সেখানে কার্যকর না করা হয়, তবে সেই রাষ্ট্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় মানুষের আধিপত্য চাপিয়ে রাখার দমনমূলক হাতিয়ার। আমরা সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে এমন একটি শ্রেণির হাতে দেব যারা পুঁজির সর্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। সকলের জন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কাজ করে— এই মিথ্যাচারের আমরা অবসান ঘটাব। এটা প্রতারণা, কারণ যতদিন শোষণ থাকবে ততদিন সাম্য আসতে পারে না। শ্রমিক ও জমিদার কখনও সমান

হতে পারে না, ভরপেট মানুষ ও ভুখা মানুষ কখনও সমান হতে পারে না। রাষ্ট্র সকল মানুষের জন্য— এই পুরনো গল্পে বিশ্বাস করে যে মানুষ ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে রাষ্ট্রের সামনে মাথা ঝোঁকাত, সর্বহারা সেই বুর্জোয়া মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেবে এবং রাষ্ট্রকে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। পুঁজিপতিদের হাত থেকে শোষণের সেই যন্ত্রটা আমরা কেড়ে নিয়েছি। এই যন্ত্রের আঘাতে আমরা শোষণকে চিরতরে বিনাশ করব। যেদিন দুনিয়ার কোথাও আর শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না, জমি বা কলকারখানার ওপর ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না, যেদিন কেউ পেট ভরে খাবে আর কেউ ক্ষুধায় মরবে এই অবস্থা থাকবে না। যেদিন এসব সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হবে সেদিন এই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে আমরা আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। সেদিন শোষণ থাকবে না, রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হবে। এইটিই কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। আমার মনে হয় পরবর্তী বক্তৃতায় আমি আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব এবং বার বারই আমাদের এই আলোচনায় ফিরে ফিরে আসতে হবে।